সুচিপত্র:

অ্যাডলফ হিটলারের ইতিহাস ও গবেষণা ২

ভূমিকা ৩

তরুণ হিটলার ৫

সাধারণ সৈনিক থেকে কর্পোরাল ১০

হেইল হিটলার ১৪

রাজনৈতিক প্রতিভা ২১

পররাষ্ট্রনীতির তিন ধাপ ৩২

ব্যর্থ হত্যাকাণ্ড ৩৯

অ্যাডলফ হিটলার সম্পর্কে কিছু ভাবনা ৪৩

ফুয়েরারের মৃত্যু ৪৬

অ্যাডলফ হিটলারের ইতিহাস ও গবেষণা

অ্যাডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ছিলেন নাৎসি পার্টির নেতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির স্বৈরাশাসক । তাঁর নেতৃত্বে জার্মানি ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণ করে, যা বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে । হিটলার ও অ্যান্টি-সেমিটিজম এর অবিলম্বে, নাজি মতবাদ এবং আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার করেন। তাঁর শাসনে ৬০ লক্ষেরও বেশি ইহুদী , রোমানি , সমকামী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার মাধ্যমে হলোকাস্ট সংঘটিত হয় । ১৯৪৫ সালে রাশিয়ান বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে হিটলার আত্মহত্যা করেন । তাঁর শাসনকালে মানবাধিকার ও শান্তি লঙ্ঘন হয়ে ইতিহাসে অন্যতম দুঃখজনক অধ্যায় হিসেবে পরিচিত ।

ভূমিকা

আডলফ হিটলার (১৮৮৯–১৯৪৫) ছিলেন নাজি পার্টির নেতা এবং জার্মানির চ্যান্সেলর। তিনি ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তার শাসনে জার্মানি তীব্র অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। হিটলারের নেতৃত্বে নাজি পার্টি জাতিবাদী এবং আক্রমণাত্মক নীতির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। তার শাসনে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, যেমন:-জুডিশ ঘাতকযাত্রা বা হলোকস্ট ঘটেছিল। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং নিষ্ঠুর নেতা হিসেবে পরিচিত, যার কর্মকাণ্ডের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

"জীবন মৃত্যুর জন্য লাইনে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কিছু লোক লাইন না দিয়ে চলে যায়।"
অ্যাডলফ হিটলার, তৃতীয় রাইখের ফুয়েরার

অ্যাডলফ হিটলার...
ইতিহাসের জন্য একটি নিকৃষ্ট এবং অজ্ঞ প্রতিকৃতি। আসলে একটি শিশু একটি সাদা কাগজের টুকরোর মতো। কত সুন্দর করে আঁকবেন, ছবিটা হৃদয়কে খুব আনন্দ দেবে। অ্যাডলফের সাথে সবকিছু অন্যরকম হতে পারত, যিনি তার কর্মকাণ্ড দিয়ে বিশ্বকে ভয় দেখিয়েছিলেন। তিনি শিল্পী হিসেবে পৃথিবীকে রঙে ভরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু রক্ত ঝরছে তার কলম থেকে, রঙ নয়।

তরুণ হিটলার

তরুণ হিটলার ছিলেন একজন উদ্দীপ্ত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, যিনি অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ শহরে ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীতে সেবা করেন, যেখানে তিনি আহত হন। যুদ্ধের পর, তিনি জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হন এবং ১৯১৯ সালে জার্মান শ্রমিক পার্টিতে (যেটি পরবর্তীতে নাজি পার্টি হিসেবে পরিচিত হয়) যোগ দেন। তরুণ হিটলার একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ভাবনা ও নেতৃত্বের পরিচয় দেন। তার বক্তৃতা ও কার্যকলাপ তাকে দ্রুত জনপ্রিয়তা এনে দেয়, যা তাকে ভবিষ্যতে জার্মানির শাসক বানায়।

১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল।

বসন্তের এক উষ্ণ দিনে, অ্যাডলফ হিটলার অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সীমান্তের কাছে ব্রাউনাউম ইনে অ্যালোইস এবং ক্লারা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা অ্যালোইস জোহান শিকলগ্রুবার ছিলেন একজন জুতা প্রস্তুতকারক এবং পরে শুল্ক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ক্লারা হিটলার এই সন্তানের জন্মের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ ক্লারা গত দুই বছরে তার তিন সন্তানকে হারিয়েছেন। অ্যাডলফের সাথে তার মায়ের অনেক মিল ছিল। ক্লারা ছিলেন সাদা চেহারার মহিলা, বড় বড় চোখ, অর্থবহ চেহারা এবং প্রকৃতিগতভাবে গম্ভীর ও পরিশ্রমী মহিলা। অ্যাডলফ তার দীর্ঘদিনের সহিষ্ণু মাকে ভালোবাসতেন। তার মা, পরিবর্তে, তার তৃতীয় পুত্রকে তার প্রিয় সন্তান হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। ক্লারা তার ছেলেকে তার সমস্ত ভালবাসা দেওয়া সত্ত্বেও, অ্যাডলফ একটি লাজুক ছেলে হিসাবে বড় হয়। এটি তার পিতা অ্যালোইসের অত্যাচারের কারণে ঘটেছিল।

অ্যালোইস হিটলার তিনবার বিয়ে করেছিলেন এবং মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রী-সন্তানদের মারধর ও গালিগালাজ করতেন তিনি। হিটলার তার স্মৃতিকথায় বেশ কয়েকবার লিখেছেন যে তার বাবা মদ্যপ অবস্থায় একজন নিষ্ঠুর, অর্থ-স্পিনার ছিলেন। সম্ভবত অন্যের প্রতি ফুয়েরারের তীব্র ঘৃণা তার নিজের পিতার প্রতি ঘৃণা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

হিটলারের পিতাকে নতুন পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং তাদের পরিবার ১৮৯২ সালে পাসাউতে চলে আসে।

১৮৯৫ সালে তরুণ হিটলার লিনজের কাছে ফিশেলহামের স্কুলে পড়াশোনা করেন। ধর্মীয় ক্লারা চেয়েছিলেন তার ছেলে যাজক হোক। এই উদ্দেশ্যে ক্লারা ১৮৯৭ সালে তরুণ হিটলারকে ল্যাম্বাচের বেনেডিক্টাইন মঠে পাঠান। একদিন সন্ন্যাসী মঠের বাগানে নদীতে ডুবে যাওয়া একটি ছেলেকে বাঁচান। এই ছেলেটি অ্যাডলফ হিটলার, এবং এই কাজের জন্য সন্ন্যাসীকে মঠ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯০০ সালের সেপ্টেম্বরে, তরুণ অ্যাডলফ লিনজের একটি পাবলিক স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময় থেকে তিনি কেবল তার পছন্দের বিষয়গুলিই অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। ভবিষ্যতের "প্রতিভা" ইতিহাস, ভূগোল এবং বিশেষত চিত্রকলায় আগ্রহী ছিলেন। হিটলার ফরাসি ভাষা পছন্দ করতেন না। ১৯২৪ সালে হিটলারের বিচারের সময় গোয়েমার, যিনি সে সময় অ্যাডলফকে ফরাসি ভাষা শিখিয়েছিলেন, বলেছিলেন: "হিটলার

নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ছিলেন, যদি একতরফা হয়। তিনি কীভাবে আচরণ করতে হয় তা জানতেন না, তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী, অসতর্ক এবং দ্রুত-মেজাজী।" একই স্কুলে তিনি ইতিহাসের শিক্ষক লিওপোল্ড পেচের কাছে জার্মানদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। লিওপোল্ড পেচই তরুণ অ্যাডলফের মনে জাতীয়তাবাদী ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

অনেক সাক্ষ্য অনুসারে, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে হিটলার তার যৌবনে সাইকোপ্যাথিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন।

হিটলারের যৌবনের বন্ধু কুবিৎসেক স্মরণ করেন যে তিনি সর্বদা সবার সাথে মতবিরোধ করতেন, তিনি তাকে ঘিরে থাকা সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করতেন। জার্মান ঐতিহাসিক জোয়াকিম ফেস্ট, যিনি হিটলারের জীবনী নিয়ে ব্যস্ত, দাবি করেছেন যে ইহুদিবিদ্বেষ এবং ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা হিটলারের ঘৃণার লক্ষ্য ছিল, যা বছরের পর বছর ধরে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এর শিকার খুঁজে পায়নি। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞার কারণে হিটলারকে বারবার ক্লাস থেকে ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৩ সালের ৩ জানুয়ারি হিটলারের বাবা হঠাৎ মারা যান। ১৩ বছর বয়সী অ্যাডলফ তখন সবে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। হিটলার ১৫ বছর বয়স থেকে নাটক, কবিতা এবং গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি উইল্যান্ডের কিংবদন্তি এবং ওয়াগনারের অপেরার জন্য লিব্রেটোও তৈরি করেছিলেন। তবে, ভবিষ্যতের ফুয়েরার ১৬ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করেছিলেন।

১৯০৭ সালের জানুয়ারিতে অ্যাডলফ হিটলারের মায়ের স্তন ক্যান্সারের জন্য একটি জটিল অপারেশন করা হয়। তার মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পরে, অ্যাডলফ একই বছরের শরত্কালে ভিয়েনায় যান। তবে ভিয়েনায় তার দুর্ভাগ্য ছিল। হিটলার ভিয়েনা অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। যেন এটুকুই যথেষ্ট নয়, ১৯০৮ সালে তার মা মারা যান। এটা ফুয়েরারের জন্য কঠিন ধাক্কা ছিল। এরপর ভিয়েনায় ভিক্ষাবৃত্তি করে ছবি বিক্রি করে ৫ বছর বসবাস করেন।

এডলফ হিটলার তার স্মৃতিকথায় ভিয়েনায় কাটানো পাঁচ বছর সম্পর্কে লিখেছেন:
ভিয়েনার অদ্ভুততা আর দারিদ্র্যের দুঃখ কেউ কখনো ভুলতে পারবে না। এই পাঁচ বছরে আমি প্রথমে শ্রমিকের কাজ করে এবং পরে ছবি আঁকার কাজ করে বেঁচে থাকার অর্থ উপার্জন করেছি। ক্ষুধা সব সময়

আমার সঙ্গী ছিল। তিনি আমাকে এক নিঃশ্বাসের জন্যও ছাড়তেন না।

১৯১৩ সালের মে মাসে হিটলার ভিয়েনা থেকে মিউনিখে চলে আসেন, যেখানে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব পর্যন্ত চিত্রশিল্পী হিসাবে কাজ করেছিল।

সাধারণ সৈনিক থেকে কর্পোরাল পর্যন্ত

আডলফ হিটলার সাধারণ একজন সৈনিক হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন ১৯১৪ সালে। তিনি ১৬ নম্বর রেজিমেন্টের সদস্য হিসেবে ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি সাহসিকতার জন্য কয়েকটি পুরস্কারও পান, তবে একইসাথে তিনি গুরুতর আহত হন। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, হিটলার আহত অবস্থায় হাসপাতালে কাটান। যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতাগুলি তার চিন্তাভাবনায় গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাকে রাজনীতিতে জড়িয়ে নেওয়ার পথপ্রশস্ত করে। ১৯১৯ সালে তিনি জার্মান শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন, এবং ধীরে ধীরে তার নেতৃত্বে "কর্পোরাল হিটলার"

হিসেবে পরিচিত হন, যার পরে তার রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়।

১৯১৩ সালের মে মাসে এডলফ হিটলার ভিয়েনা ছেড়ে মিউনিখে পৌঁছান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সামরিক সেবার জন্য একটি মেডিকেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ফুয়েরার এত দুর্বল হওয়ায় ডাক্তাররা তাকে সামরিক সেবার জন্য অযোগ্য বলে মনে করেন।

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। দেশপ্রেমিক হিটলার আগস্ট মাসে বাভারিয়ান সরকারকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। অ্যাডলফকে ১৬ তম বাভারিয়ান পদাতিক রেজিমেন্টে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা মূলত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে গঠিত। ৮ অক্টোবর তিনি বাভারিয়ার রাজা তৃতীয় লুডভিগ এবং সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। কয়েক সপ্তাহ সামরিক প্রশিক্ষণের পর তিনিও রণাঙ্গনে চলে যান। প্রথমে তিনি প্যারামেডিক ছিলেন, পরে কমিউনিকেটর হিসেবে কাজ করতেন। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে হিটলারকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠানো হয় এবং ২৯ অক্টোবর ইজের যুদ্ধে এবং ৩০ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ইপ্রেসের যুদ্ধে অংশ নেন। ২৫ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ফ্ল্যান্ডার্সে অবস্থানগত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন, অ্যাডলফ হিটলারকে ভূষিত করা হয়েছিল আয়রন ক্রস প্রথম শ্রেণি ১৯১৪ সালের ২ ডিসেম্বর, শত্রু অফিসার এবং ১৫ জন সৈন্যকে বন্দী করার জন্য। ১৯১৫ সালে, তিনি নিউ চ্যাপেল, লা বাসে এবং আরাসের যুদ্ধে এবং ১৯১৬ সালে সোমের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

সোমের প্রথম যুদ্ধে তিনি গ্রেনেডের আঘাতে বাম উরুতে আহত হন এবং পটসডামের কাছে রেড ক্রস হাসপাতালে ভর্তি হন। মজার ব্যাপার হলো, এক রাতে অ্যাডলফ প্রয়োজনের তাগিদে চলে যায়। একই সময়ে, একটি বোমা তাঁবুতে আঘাত করে যেখানে তিনি শুয়ে আছেন। তার কোনো ক্ষতি হবে না। হাসপাতাল ছাড়ার পরে, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে তিনি ১ম রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের দ্বিতীয় সংস্থায় রেজিমেন্টে ফিরে আসেন। ১৯১৮ সালে, হিটলার ফ্রান্সে বসন্ত আক্রমণ, এব্রোস এবং মন্ডিডিয়ারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার চার সপ্তাহ আগে, হিটলারকে গ্যাস বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আরও চার মাস ল্যাজারেটে (সামরিক হাসপাতাল) কাটাতে হয়েছিল।

অনেক সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি একজন সাহসী ও চমৎকার সৈনিক ছিলেন।

- অ্যাডলফ মায়ার, ১৬ তম বি তে হিটলারের সহকর্মী।

জার্মানির ভবিষ্যত নেতা চার বছর ধরে যুদ্ধের হট স্পটে ছিলেন, মোট ৪৭ টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং দু'বার আহত হয়েছিলেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় ফুয়েরার অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হন। এইভাবে, সাহসী এবং সাহসী বেসরকারী সৈনিক অ্যাডলফ হিটলারকে "ইউফ্রেইটার" পদে উন্নীত করা হয় (জার্মান সেনাবাহিনীতে একটি সামরিক পদ যা কঠিন সময়ে অস্থায়ী স্কোয়াড নেতা হিসাবে কাজ করতে পারে)

হেইল হিটলার!

"হেইল হিটলার!" ছিল নাজি পার্টির শ্লোগান, যা আডলফ হিটলারের প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হত। এটি মূলত হিটলারের ব্যক্তিত্ব গভীর অনুরক্তি **-এর অংশ ছিল, যেখানে তাকে "দ্য ফুয়েরার" (নেতা) হিসেবে পূজ্য, অশ্রদ্ধেয় এবং অব্যাহত সমর্থনের প্রতীক হিসেবে দেখা হত। নাজি পার্টির সদস্যরা এই শ্লোগান উচ্চারণ করে হিটলারের প্রতি আনুগত্য এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত**

করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি শাসন, সন্ত্রাস এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হত। হিটলারের শাসনকালে এটি জার্মানির সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং বহু মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। লেফটেন্যান্টের মতে, ওয়েমার এবং তার সমর্থকরা পরাজয়ের কারণ ছিল।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে হিটলার মিউনিখে ফিরে আসেন।

ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর পরামর্শে হতাশাগ্রস্ত অ্যাডলফ জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দেন। ১৯১৯-২১ সালে হিটলার ফ্রিডরিখ কোনের লাইব্রেরিতে মন দিয়ে বই পড়তে শুরু করেন। এতে থাকা বইগুলি তাদের বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইহুদিবিদ্বেষের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং হিটলারের বিশ্বাসের উপর গভীর চিহ্ন রেখেছিল। হিটলারের জীবনের একটি নির্ধারক মুহূর্ত ছিল ইহুদিবিদ্বেষের সমর্থকদের দ্বারা তার স্বীকৃতি। এই দলের প্রতিনিধিরা প্রতিদিন মিউনিখের বার্গারব্রুকলার বিয়ার বারে জড়ো হন। ফুয়েরার দৈনিক সভায় বক্তৃতা দিয়ে সমর্থকদের জড়ো করতে শুরু করেন এবং তার সমর্থকরা অ্যাডলফ হিটলারকে দলীয় নেতার পদে উন্নীত করেন। ফুয়েরার দলের নাম পরিবর্তন করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (এনএসডিএপি) রাখেন। সেই সময় পর্যন্ত গঠিত হিটলারের মূল

ধারণাগুলি এনএসডিএপি-র কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়।

জার্মানির ভাবী নেতা নতুন দলের কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন। হিটলার নিম্নলিখিতগুলি করতে চেয়েছিলেন:

প্রথমটি হল একটি শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য গড়ে তোলা;

দ্বিতীয়ত- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের জন্য এন্টেন্তে দেশগুলোর ওপর প্রতিশোধ;

তৃতীয়টি হল জার্মান জাতির বিশুদ্ধ জাতিকে সংরক্ষণ করা এবং এটিকে সর্বোচ্চ জাতি হিসাবে উত্থাপন করা;

চতুর্থত- ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

প্রোগ্রামটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে এটি কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। সে সময় দেশের পরিস্থিতি খুবই কঠিন ছিল। কারণ জার্মানিকে এন্টেন্তে দেশগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। এ অবস্থায় অ্যাডলফ হিটলার তার আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি ও জ্বালাময়ী বাণী দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ১৯২০ এর দশকের গোড়ার দিকে, এনএসডিএপি বাভারিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ

সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। হিটলার স্বস্তিকা এবং "হেইল হিটলার" স্যালুটকে নাসি পার্টির সরকারী প্রতীক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন. উপরন্তু, দলের সভা রক্ষার জন্য, হিটলার আক্রমণ স্কোয়াড "ব্রাউন সংগঠিত শার্ট" (এসএ) তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যাপ্টেন আর্নস্ট রোহমের নেতৃত্বে।

পরে, সিসি "ব্ল্যাক শার্টস" বিচ্ছিন্নতা গঠিত হয়েছিল এবং এই গোষ্ঠীটি অ্যাডলফ হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়ে ওঠে। এই গার্ড অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, এর সদস্যরা তাদের রক্তের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত তাদের লোমের জন্য লড়াই করার শপথ নিয়েছে।

১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে ফ্রান্স রুহর দখল করে। এই প্রেক্ষাপটে জার্মানিতে সংকট শুরু হয়। ১৯২৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাইখ চ্যান্সেলর গুস্তাভ স্ট্রেসম্যানের নেতৃত্বে নতুন সরকার ফ্রান্সের সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং ডানপন্থী ও কমিউনিস্ট উভয়ের দ্বারাই আক্রান্ত হয়। রক্ষণশীল বাভারিয়ান মন্ত্রিসভা ২৬ সেপ্টেম্বর জরুরি অবস্থা জারি করে এবং ডানপন্থী

রাজতন্ত্রবাদী গুস্তাভ ভন কাহরকে বাভারিয়ার রাজ্য কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেয়, তাকে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদান করে। কাহর স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন যে জার্মানিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আরোপিত জরুরি অবস্থা বাভারিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এনএসডিএপি অঙ্গ বন্ধ করা সহ বার্লিনের বেশ কয়েকটি আদেশ মেনে চলেনি।

হিটলার, রোমে মুসোলিনির যাত্রার উদাহরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বার্লিনের দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ৮ নভেম্বর মিউনিখের বার্গারব্রেউকেলার বিয়ার হলে কার, লসো এবং সিজারের অংশগ্রহণে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হিটলার যুদ্ধের নায়ক জেনারেল এরিক লুডেনডর্ফের সাথে একমত হয়ে দেশে বিপ্লবের ঘোষণা দেন। ভন কারের নেতৃত্বে উচ্চপদস্থ বাভারিয়ান কর্মকর্তারা এই ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। রাতে এনএসডিএপি বিচ্ছিন্নতা মিউনিখের প্রশাসনিক ভবন দখল করতে শুরু করে। কিন্তু শীঘ্রই ভন কাহার এবং তার সমর্থকরা কেন্দ্রের সাথে একটি চুক্তিতে আসার সিদ্ধান্ত নেন। 9 নভেম্বর, যখন হিটলার তার সমর্থকদের কেন্দ্রীয় চত্বরে নিয়ে যান এবং ফেল্ডজেরেনহলের দিকে যাত্রা করেন, তখন সরকারী সামরিক ইউনিটগুলি তাদের উপর গুলি চালায়। জার্মানির ইতিহাসে এই ঘটনাগুলো "বিয়ার বিদ্রোহ" নামে পরিচিত।

১৯২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি হিটলারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যখন তাকে আদালত কক্ষে মেঝে দেওয়া হয়েছিল, তখন ফুয়েরার তার বক্তৃতা দক্ষতা ব্যবহার করে বলেছিলেন: "আমার মতামত হ'ল: ফরাসি তরোয়ালের আঘাতে মারা যাওয়ার চেয়ে আমি বলশেভিস্ট জার্মানিতে ফাঁসি হতে পছন্দ করব। এমনকি যদি আপনি আমাদের

হাজার বার দোষী সাব্যস্ত করেন, ইতিহাসের শাশ্বত আদালত আমাদের খালাস দেবে এবং আপনার আদালতের সিদ্ধান্তকে উপহাস ও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

এই জ্বালাময়ী ভাষণের পর মানুষ হিটলারকে নায়ক হিসেবে দেখতে শুরু করে। এটাই হিটলারের আগাম মুক্তির কারণ। অর্থাৎ, ফুয়েরারকে মাত্র ৯ মাস কারাগারে কাটাতে হবে।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে তারা তাকে ক্ষমা করতে বাধ্য হয়। কারণ জনগণের মধ্যে যার সুনাম বেড়ে গিয়েছিল সেই নেতাকে সরকার ধরে রাখতে পারেনি।

মুক্তি পাওয়া নাৎসি নেতা তার অস্ট্রিয়ান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন। এরপর তিনি জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রচারণা শুরু করেন। এভাবে তাকে অনেক সাহায্য করেছেন আর্নস্ট রোহম। অ্যাসল্ট স্কোয়াডগুলি শীঘ্রই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জার্মানির ডানপন্থী চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা ভাই গ্রেগর এবং অটো স্ট্রেসার জার্মানির জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ওয়ার্কার্স পার্টির পুনর্জাগরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা এনএসডিএপি-র কাতারে যোগ দেন। এভাবে প্রাদেশিক পর্যায়ের পার্টি একটি জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯২৬ সালে হিটলারের যুব সংগঠন "হিটলার ইয়ুথ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে, ফুয়েরার প্যান-জার্মান স্তরে দলের পক্ষে সমর্থন খুঁজছিলেন। তিনি জার্মানির বেশ কয়েকজন বিখ্যাত জেনারেলের আস্থা অর্জন করেছিলেন এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী

ফ্রিটজ থাইসেনের সহায়তায় তিনি জার্মানির শিল্পপতিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এ সময় তিনি রুডলফ হেসকে লেখা তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মাইন ক্যাম্ফ লেখেন। বইটির মূল ভাবনায় পার্টি কর্মীদের কর্মসূচিতে সামাজিক ডারউইনবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। এতে বলা হয়েছে, ব্যক্তি ও জাতি উভয়ই টিকে থাকার জন্য চলমান সংগ্রামের বিষয়।

জার্মানি পারে শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লড়াই করলেই আবার মহান দেশ হয়ে উঠবে। বইটি যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বড় ব্যবসায়ীদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতেই হিটলারের মাইন ক্যাম্ফ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং শীঘ্রই নাৎসিদের বাইবেলে পরিণত হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের মধ্যে, বইটি এগারোটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং ৫.২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছিল।

"সমাপ্তি উপায়কে ন্যায়সঙ্গত করে।“ এই বাক্যটি বিখ্যাত দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির অন্তর্গত। তাঁর কাজ "দ্য প্রিন্স" অনেক রাজনীতিবিদদের জন্য

পথপ্রদর্শক তারকা হিসাবে কাজ করেছিল। এই রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন হলেন অ্যাডলফ হিটলার। ফুয়েরার তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করেছিলেন।

জার্মান জনগণ তার জ্বালাময়ী ভাষণে বিশ্বাস করে এবং হিটলারকে সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞরাই ক্ষমতায় আসে। এই ঘটনা ছিল ইতিহাসের এক টার্নিং পয়েন্ট।

রাজনৈতিক প্রতিভা

আডলফ হিটলারের রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল তার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি, জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা এবং সঙ্কটকালে শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী। তিনি জাতিগত এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম ছিলেন। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উগ্র এবং তিনি জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সহিংসতার ব্যবহারকে ন্যায্যতা দিতেন। নাজি পার্টি প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায় আসার পর, তিনি জার্মান সমাজে একটি একনায়কত্বের ভিত্তি তৈরি করেন। তার রাজনৈতিক দক্ষতা তাকে দ্রুত ক্ষমতায় উঠতে সহায়তা করেছিল, যদিও তার শাসন মানবতার জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনে।

হিটলার সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসা জয় করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি বেশিরভাগ গ্রামবাসীর সামনে উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিতেন। হিটলার সাধারণ মানুষের সামনে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রতিনিধিদের উপহাস করেছিলেন।

১৯২৮ সালে জার্মান পার্লামেন্ট নির্বাচনে হিটলারের নাৎসি পার্টি ১২টি আসন লাভ করে। ১৯২৯ সালে জার্মানিতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। একই সময়ে, ফুয়েরার জাতীয়তাবাদী আলফ্রেড রোজেনবার্গের সাথে একটি জোট গঠন করেছিলেন। ১৯২৮-১৯৩২ সাল ছিল জার্মানির ইতিহাসে সবচেয়ে জটিল সময়। কারণ ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি বিজয়ী দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছিল। উপরন্তু, জার্মান জনগণ তাদের নিজের দেশের কয়লা খনি থেকে কয়লা চুরি করে জীবনযাপন করত। কারণ সে সময় সব কয়লা খনি ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েছে। চার বছর ধরে উৎপাদন ক্রমাগত কমছে। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে, শিল্প উত্পাদন ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকৃত মজুরি ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দেশে বেকারের সংখ্যা ৯০ লাখ ছাড়িয়েছে। এটি

ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সত্যিকারের বিপর্যয় ছিল।

এই পরিস্থিতি অ্যাডলফ হিটলারের জন্য একটি বাস্তব উপহার ছিল। গুস্তাভ ক্রুপ, রবার্ট বোশ, ফ্রিটজ থাইসেন এবং আলফ্রেড গুটেনবার্গের মতো ম্যাগনেটরা তাকে আরও বেশি সমর্থন করেছিলেন। মধ্যে ১৯৩০ রাইখস্ট্যাগ নির্বাচন, এনএসডিএপি প্রায় ছয় মিলিয়ন ভোট জিতেছে এবং সংসদে ১০৭ টি আসন জিতেছে। এটি নাৎসি পার্টিকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেছিল। আবার, হিটলার জার্মান জনগণকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অপমানের কথা তিনি বারবার সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। ফুয়েরার সংসদীয় শাসন ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলুপ্তির পক্ষে ছিলেন। এছাড়াও, হিটলার জার্মান জাতির অনন্যতার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং জার্মানিকে একীভূত করার প্রয়োজনীয়তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, অর্থাৎ ভার্সাই চুক্তির অধীনে হারানো অঞ্চল এবং উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দেওয়া।

১৯৩২ সালে, ফুয়েরার, যিনি জার্মান নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন, এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এডলফ হিটলার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার প্রচারণা সংগঠিত করেছিলেন। তার প্রতিপক্ষ ছিলেন পল ভন হিন্ডেনবার্গ এবং আর্নস্ট টেলম্যান। ১৯৩২ সালের ২৩ শে মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে, হিন্ডেনবার্গ ৪৯.৬% ভোট পেয়েছিল এবং হিটলার ৩০.১% ভোট পেয়েছিলেন। ১০ এপ্রিল, পুনরাবৃত্তি ভোটে, হিন্ডেনবার্গ ৫৪% ভোট পেয়ে জার্মানির রাষ্ট্রপতি হন।

১৯৩২ সালের ৪ জুন রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবার্গ রাইখস্ট্যাগ ভেঙে দেন। সে বছরের ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এনএসডিএপি ৩৭.৮% ভোট এবং রাইখস্ট্যাগে অতিরিক্ত ২৩০ টি আসন নিয়ে একটি ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছিল। ৬ নভেম্বর পার্লামেন্টে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএপি ৩৩.১ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং রাইখস্ট্যাগে ১৯৬ টি আসন জিতেছে। ১৯৩২ সালের ৩ ডিসেম্বর কার্ট ভন শ্লেইচার চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। নবগঠিত সরকার বড় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ পরিবেশন করতে শুরু করে। সরকার বেকারত্ব ভাতা, সামাজিক সুরক্ষা প্রদান এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করেছে। দেশে চলমান

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ফ্যাসিবাদের উত্থান ও ক্ষমতায় আরোহণের পথ প্রশস্ত করেছে।

ফুয়েরার দেশের বেকারত্বের অবসান, মধ্যবিত্তকে সুস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপান্তরিত করার, সুদের অবসান ঘটানোর এবং ভূমিহীন বা ভূমিহীন কৃষকদের প্রাচ্যের উর্বর জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ফ্যাসিস্টদের কথা: "ভার্সাই চুক্তি নিপাত যাক", "ফটকাবাজদের নিপাত যাক!", "পচা সরকার নিপাত যাক" জনমনে ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতির অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল।

১৯৩৩ সালের ৪ জানুয়ারি হিটলার ব্যাংকার শ্রোডারের বাসায় রাজনীতিবিদ পাপেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং থার্ড রাইখ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। হিটলার ভন পাপেনকে জার্মান পিপলস পার্টির ভাইস চ্যান্সেলর এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হিটলারের সাথে ভন পাপেন এবং হিন্ডেনবার্গের জোট শ্লেইচারের সরকারকে বিভক্ত করেছিল। ১৯৩৩ সালের ২৮ জানুয়ারি শ্লেইচার পদত্যাগ করেন। এদিকে, হিটলার, পাপেন এবং হিন্ডেনবার্গ সরকার গঠনের বিষয়ে একমত হন।

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিন্ডেনবার্গ শ্লেইচারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং হিটলারকে চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন। এটি ছিল অ্যাডলফ হিটলারের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্ত, যিনি ছোটবেলায় যথেষ্ট ভালবাসা পাননি, যিনি ভিয়েনায় পড়াশোনা করতে পারেননি এবং রাস্তায় ভিক্ষা করছিলেন। এই নিয়োগ হিটলারকে পূর্ণতা দেয়নি।

দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ। প্রথমত, জার্মানির যে কোনও আইন রাইখস্ট্যাগ দ্বারা পাস করা যেতে পারে এবং হিটলারের দলের এতে পর্যাপ্ত ভোট ছিল না। দ্বিতীয়ত, খোদ দলের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ বিভাজন ছিল। আর্নস্ট রোহমের নেতৃত্বে পার্টির একদল সদস্য হিটলারের বিরোধিতা শুরু করেন। তৃতীয়ত, রাইখ চ্যান্সেলরকে কেবল মন্ত্রিসভার প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হত। তবে মাত্র দেড় বছরের মধ্যে হিটলার সব বাধা দূর করে সীমাহীন স্বৈরশাসকে পরিণত হন। এই ঘটনাগুলি গণতন্ত্রের সমাপ্তি এবং জার্মানিতে সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের সূচনা করেছিল।

তিনি হিন্ডেনবার্গকে "জনগণ ও রাষ্ট্রের সুরক্ষা সম্পর্কে" ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিয়েছিলেন। এই ফরমান ফুয়েরারকে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করে। এখন রাইখস্ট্যাগের প্রধান তার ডিক্রি দিয়ে দেশ শাসন করতে পারেন।

ফুয়েরার ক্ষমতায় আসার পর তিনি প্রথমে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি হিটলার রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম দমন করার জন্য রাইখস্ট্যাগ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন এবং এই কাজটি কমিউনিস্টদের কাছে হস্তান্তর করেন। অর্থাৎ হিটলারের অন্যতম বিশ্বস্ত ব্যক্তি জেরিনের হেডকোয়ার্টার থেকে শুরু করে আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে রাইখস্ট্যাগ ভবনে ঢুকে পড়ে নাৎসিরা। এরপর তারা ভবনের কার্পেট ও পর্দায় দাহ্য তরল ঢেলে মানসিক প্রতিবন্ধী সাবেক এক ডাচ কমিউনিস্টকে এনে ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসব কারণে হিটলার প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং পার্লামেন্টে পুনঃনির্বাচনের অনুমোদন লাভ করেন। ১৯৩৩ সালের ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে

নাৎসিরা রাইখস্ট্যাগে তাদের প্রতিনিধি ১৯৬ থেকে ২৮৮ এ উন্নীত করে। ট্রেড ইউনিয়ন বিলুপ্ত করা হয়, তাদের সম্পত্তি শ্রমিক ফ্রন্টে হস্তান্তর করা হয়। এরপর নাৎসি পার্টি ছাড়া সব রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম দেশটিতে নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানিতে অচিরেই বাক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। যে কোনও ভিন্নমতাবলম্বী যারা হিটলারের সরকার পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিল তাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ফুয়েরার একটি সরকার তৈরি করেছিলেন যা তার আনুগত্য করেছিল। তিনি শিক্ষা ও ধর্মকে ফ্যাসিবাদের অধীনস্থ করেছিলেন।

ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী নাৎসি নেতা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এমন এক সময়ে নভেম্বর বিপ্লবকে প্ররোচিত করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন যখন জার্মানির ভাগ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নির্ধারিত হচ্ছিল এবং কমিউনিস্টদের সোভিয়েত গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।

তার এক বক্তৃতায় ফুয়েরার প্রকাশ্যে কমিউনিস্টদের নিন্দা করে বলেছিলেন: "রাশিয়ায় মার্কসবাদের জয় হয়েছে। তিনি কি রাশিয়ার দারিদ্র্য দূর করতে পেরেছেন? বিশ্বের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে এমন একটি দেশে লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় ভ্রাতৃত্ববোধ। এই ভ্রাতৃত্ববোধের কথা আমরা জানি। শত সহস্র, এমনকি

এই ভ্রাতৃত্বের নামে এবং 'মহাসুখের' ফলে লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। এমনকি তারা বলছে আমরা পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে যাব। যারা জার্মানিতে এই সিস্টেমটি ইনস্টল করতে চান তাদের সাইবেরিয়ায় কমপক্ষে এক সপ্তাহ লগ ইন করার পরামর্শ দিচ্ছি।

তার এক বক্তৃতায় ফুয়েরার প্রকাশ্যে কমিউনিস্টদের নিন্দা করে বলেছিলেন: "রাশিয়ায় মার্কসবাদের জয় হয়েছে। তিনি কি রাশিয়ার দারিদ্র্য দূর করতে পেরেছেন? বিশ্বের শস্যভাণ্ডারে পরিণত হতে পারে এমন একটি দেশে লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় ভ্রাতৃত্ববোধ। এই ভ্রাতৃত্ববোধের কথা আমরা জানি। শত সহস্র, এমনকি

এই ভ্রাতৃত্বের নামে এবং 'মহাসুখের' ফলে লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। এমনকি তারা বলছে আমরা পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে যাব। যারা জার্মানিতে এই সিস্টেমটি ইনস্টল করতে চান তাদের সাইবেরিয়ায় কমপক্ষে এক সপ্তাহ লগ ইন করার পরামর্শ দিচ্ছি।

এই অবৈধ গণহত্যার পর এডলফ হিটলার থার্ড রাইখের একনায়কে পরিণত হন। এরপর জার্মানিতে আইনের শাসনের অবসান ঘটে। সমস্ত সেনা অফিসার ব্যক্তিগতভাবে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে, রাষ্ট্রীয় গোপন পুলিশ "গেস্টাপো" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি দেশের অভ্যন্তরে

শত্রুদের খুঁজে বের করে ধরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফুয়েরার, গোরিং, গোয়েবলস, গিমলারদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিশেষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। হিটলার গিমলারকে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করার নির্দেশ দেন।

ইহুদিবিদ্বেষ ছিল হিটলারের অভ্যন্তরীণ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, নাগরিকত্ব এবং বর্ণ সম্পর্কিত নুরেমবার্গ আইন পাস হয়েছিল। তার মতে, ইহুদিদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং জার্মান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এক কথায় জার্মানি একটি সম্পূর্ণ কারাগারে পরিণত হয়েছে। শুরু হয় ইহুদিদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন। ১৯৩৮ সালের শরত্কালে, সমস্ত জার্মান ইহুদিদের গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। এই নীতির সমাপ্তি ছিল "এন্ডলিওজুং" (ইহুদি প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান) অপারেশন, যার লক্ষ্য ছিল পুরো ইহুদি সম্প্রদায়ের শারীরিক ধ্বংস। ১৯২৯ সালে হিটলার প্রথম এই নীতি ঘোষণা করলে ইহুদিদের গণহত্যা শুরু হয়।

হিটলার কেন ইহুদিদের ঘৃণা করতেন? এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন ঐতিহাসিকদের কাছে। বিশেষ করে একদল ঐতিহাসিক বলেন, 'হিটলার জার্মান জাতিকে সর্বোচ্চ জাতির পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ইহুদিদের হত্যা করেছিলেন।

কারণ ইহুদীরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ (নির্বাচিত) জাতি মনে করত।

বিভিন্ন গুজব রয়েছে যে "ইহুদিরা হিটলারের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল যখন তিনি তরুণ ছিলেন, তাই ফুয়েরার ইহুদিদের ঘৃণা করেন। অন্যান্য সূত্র অনুসারে, হিটলার যখন ভিয়েনা একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে প্রবেশের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তখন ইহুদি শিল্পী এটি পাস করেননি।

পররাষ্ট্রনীতির তিনটি পর্যায়সমূহ

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত ছিল:

১. **পুনঃসামরিকীকরণ**: **১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর, হিটলার জার্মানির আর্মির পুনর্গঠন শুরু করেন এবং ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড পুনরুদ্ধার করেন। তিনি জাতিসংঘের শর্ত ভঙ্গ করে জার্মানি পুনরায় সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন।**

২. **অষ্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া দখল**: **১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ার স্যুদেটেনল্যান্ড অঞ্চলের দখল করেন, যা ইউরোপে অস্থিরতা সৃষ্টি করে।**

৩. **বিশ্বযুদ্ধের সূচনা**: ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণ করে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়।

অ্যাডলফ হিটলারের বৈদেশিক নীতি তিনটি সময়কালে বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রথম সময়কালে ১৯৩৩ – ১৯৩৬ সাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সময়কালে, ফুয়েরার নিজেকে "সংবেদনশীল" হিসাবে দেখিয়েছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এই সময়ে, হিটলার ঘোষণা করেছিলেন যে জার্মানি ভার্সাই চুক্তির সামরিক ধারা থেকে সরে আসবে। এবং এটি ছিল ভার্সাই চুক্তির প্রকৃত সমাপ্তি। ট্যাঙ্ক সেনা তৈরি করা হয়েছিল এবং সামরিক বিমান চালনা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। রাইন ডিমিলিটারাইজড জোনের মর্যাদা বাতিল করা হয়। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্লিন অলিম্পিক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এই পদক্ষেপের মূলে জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

১৯৩৫ সাল থেকে জার্মানিতে সাধারণ সামরিক সেবা চালু হয় এবং সার অঞ্চল (১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি অনুসারে, সার অঞ্চলটি ১৫ বছরের জন্য লীগ অফ নেশনসের প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়)

ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ৩০ জুন জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি নৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার মতে, জার্মানি গ্রেট ব্রিটেনের নৌবাহিনীর ৩/১ এর সমান নৌবাহিনী তৈরির সুযোগ পেয়েছিল।

একই সঙ্গে জার্মানির অভ্যন্তরীণ নীতিতেও ইতিবাচক ফল দেখা যেতে শুরু করে। বেকারত্বের হার নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

অভাবী জনগোষ্ঠীকে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বড় আকারের পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। গণ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে, শিল্পটি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, বড় আকারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল এবং কৌশলগত রিজার্ভ তৈরি করা হয়েছিল। এটা বলা যেতে পারে যে জার্মানি বিজ্ঞান, উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বিকাশে একটি সন্দেহাতীত নেতা হতে পারত যদি এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ না হত।

দ্বিতীয় সময়কাল জুড়ে ১৯৩৬-১৯৩৯ বছর। এ সময় জার্মানি হিটলারের নেতৃত্বে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোবাদীদের সমর্থন দেয়। এই বছরগুলোতে হিটলারের পরিকল্পনা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যে এই

গতির মূল কারণ ছিল হিটলার তার গুরুতর অসুস্থতা ও আসন্ন মৃত্যুতে বিশ্বাস করতেন এবং তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তড়িঘড়ি করতেন। তিনি তাঁর মৃত্যুতে এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তিনি ১৯৩৭ সালের ৫ নভেম্বর তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র এবং ১৯৩৮ সালের ২ মে ব্যক্তিগত ইচ্ছাপত্র লিখেছিলেন।

একই সময়ে, ক্ষমতায় পূর্ণ হিটলার বিভিন্ন অঞ্চল দাবি করেছিলেন। এটি দিয়ে, ফুয়েরার আসন্ন যুদ্ধের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড তৈরি করেছিলেন। বিশেষত, ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে "অ্যান্টি-কমিন্টার্ন চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। এক বছর পর ইতালি এই চুক্তিতে যোগ দেয়। এভাবে বার্লিন-রোম-টোকিও তিন রাষ্ট্রের আগ্রাসী জোট গড়ে তোলে। হিটলার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছেন

তার শিকারদের অজান্তে রাখার জন্য মিথ্যার ব্যবহার। ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণরূপে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নেতা, যার ক্ষুধা দিন দিন বাড়তে থাকে, তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার সুদাতেন অঞ্চল দাবি

করেন। ১৯৩৮ সালে স্বাক্ষরিত "মিউনিখ" চুক্তি অনুসারে, সুদাতেনল্যান্ড জার্মানিকে দেওয়া হয়েছিল।

'টাইম' ম্যাগাজিন ১৯৩৯ সালের ২ জানুয়ারি তাদের সংখ্যায় হিটলারকে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার-১৯৩৮' বলে অভিহিত করে। "ম্যান অফ দ্য ইয়ার" কে উত্সর্গীকৃত নিবন্ধটি নিম্নলিখিত শব্দগুলি পড়ে: "হিটলার, জার্মান জনগণের ফুয়েরার, জার্মান সেনা, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, তৃতীয় রাইখের চ্যান্সেলর।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেক প্রজাতন্ত্রের বাকি অংশ দখল করা হয় এবং লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেদা অঞ্চল সংযুক্ত করা হয়। এরপর হিটলার পোল্যান্ডের কাছে আঞ্চলিক দাবি আদায়ের আবেদন করেন। হিটলার বিবেচনায় নেননি যে এই দাবিটি পোল্যান্ডের মিত্রদের সাথে দ্বন্দ্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে - গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স, বা তিনি এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেছিলেন।

তৃতীয় সময়কালে ১৯৩৯ - ১৯৪৫ সাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট হিটলার

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। সেপ্টেম্বরে পোল্যান্ডকে পরাজিত করা জার্মান ফুয়েরার ক্ষুধায় পূর্ণ ছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল-মে মাসে তিনি নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস আক্রমণ করেন।

লুক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়াম, এবং অবশেষে ফ্রান্স আক্রমণ। ফ্রান্সও জুন মাসে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪১ সালের বসন্তে নাৎসি জার্মানি একের পর এক গ্রিস ও যুগোস্লাভিয়া দখল করে নেয় এবং ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ১৯৪১ সালের ২২ জুলাই জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত অতিক্রম করে। ৯ ডিসেম্বর মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মান সেনাবাহিনী পিষ্ট হয়। এরপর হিটলার কমান্ডার-ইন-চিফ, ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার ভন ব্রাউচিটসকে বরখাস্ত করেন এবং সমস্ত সামরিক অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে একটি দখলদার শাসন কায়েম করা হয়। ফ্যাসিবাদীরা তাদের শাসনকে

"নতুন আদেশ" বলে অভিহিত করেছিল। চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে মৃত্যু শিবির স্থাপন করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যু শিবিরে মারা গেছে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ। বন্দীদের সোনার দাঁত টেনে বের করে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। জাহাজের মাস্তুলের জন্য দড়ি বন্দী মহিলাদের চুল থেকে বোনা হয়েছিল। মহিলাদের ব্যাগ এবং গ্লাভস শিশুদের ত্বক থেকে তৈরি করা হয়। মানুষের চর্বি থেকে সাবান তৈরি হয়। মৃতদেহগুলো গ্যাসের উনুনে পুড়িয়ে সার হিসেবে মাঠে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এসব অত্যাচার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪২-১৯৪৩ সালে, হিটলারের সেনাবাহিনী ভারী ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং পিছু হটতে শুরু করে। পূর্বে, সৈন্যরা, যা ইউএসএসআর এবং মিশর থেকে বড় পরাজয়ের শিকার হতে শুরু করে, অ্যাংলো-আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল

পশ্চিম। ১৯৪৪ সালে সোভিয়েতের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মুক্ত হয়। রেড আর্মি পোল্যান্ড এবং বলকান অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। একই সময়ে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্সকে প্রায় মুক্ত করেছিল।

এই বছরের অক্টোবরের শেষের দিকে, যুদ্ধটি রাইখের অঞ্চলে চলে যায়। ১৯৪৫ সালে হিটলার তার সদর দপ্তর পুরোপুরি বার্লিনে স্থানান্তর করেন। ৩ জানুয়ারি রেডিওতে তিনি বলেন, 'শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের পক্ষেই থাকবে। কিন্তু জার্মানি যে যুদ্ধে হেরে গেছে তা দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল রাতে ইম্পেরিয়াল ক্যাবিনেট ভবনে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর আগে ফুয়েরার দাবি করেছিলেন যে যুদ্ধটি রাষ্ট্রপ্রধানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল যারা ইহুদিদের স্বার্থে কাজ করেছিল। এরপর এডলফ হিটলার ও ইভা ব্রাউন আত্মহত্যা করেন। তাদের দেহে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ৩০ এপ্রিল, সকাল ১০:০০ টায়, রেডিওতে ফুহরারের মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হবে।

হিটলার তার ক্ষমতায় আরোহণ এবং তার শাসনামলে মিথ্যা ও সন্ত্রাসের ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এসব কিছুই তাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। সারা বিশ্বের

চোখে অ্যাডলফ হিটলার হয়ে উঠেছিলেন শয়তানের প্রতীক

অসফল হত্যাকাণ্ড

আডলফ হিটলারের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গুপ্তহত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ঘটনা হলো ২০ জুলাই, ১৯৪৪ সালে "ভল্কনার প্লট" নামক হত্যাচেষ্টা। কিছু জার্মান সেনা অফিসার, যেমন কোল্ড হফস এবং স্টাউফেনবার্গ, হিটলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। তারা একটি বিস্ফোরক ডিভাইস হিটলারের কাছাকাছি রেখে দেন, তবে বিস্ফোরণটি প্রত্যাশিত শক্তিতে ঘটেনি। হিটলার জীবিত রক্ষা পান এবং পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়। হত্যাচেষ্টার পর, হামলার সঙ্গে জড়িত প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা হিটলারের শাসনকালে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এক বড় দমন-পীড়ন সৃষ্টি করে।

যদিও এডলফ হিটলারকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, ফুয়েরার তার নিজের অস্ত্র এবং নিজের হাতে মারা গিয়েছিলেন। নিচে ব্যর্থ হত্যাকাণ্ডগুলো তুলে ধরা হলো:

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩০ সালে 'কাইসেরহফ' হোটেলে। হিটলার যখন তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে মিম্বর থেকে নেমে আসছিলেন, তখন অজ্ঞাত এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে তার মুখে বিষ ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হিটলারের দেহরক্ষীরা সময়মতো আক্রমণকারীকে লক্ষ্য করে এবং তাকে নিষ্ক্রিয় করে।

১৯৩২ সালের ১ মার্চ, চারজন অজ্ঞাত ব্যক্তির একটি দল মিউনিখের আশেপাশে একটি ট্রেনে গুলি চালায়, যেখানে হিটলার তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। হিটলারের কোনো ক্ষতি হবে না।

১৯৩২ সালের ২ জুন স্ট্রালসুন্ড শহরের কাছে রাস্তায় একদল অজ্ঞাত ব্যক্তি হিটলারের গাড়িতে

অতর্কিত হামলা চালায়। হিটলার আর আহত হবেন না।
১৯৩২ সালের ৪ জুলাই নুরেমবার্গে হিটলারের গাড়িতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা গুলি চালায়। হিটলারের হাতে একটি ছোট ক্ষত ছিল।
১৯৩৩ এবং ১৯৩৮ এর মধ্যে, হিটলারের জীবনের উপর আরও ১৬ টি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ৯ নভেম্বর, "বিয়ার বিদ্রোহ" এর ১৫ তম বার্ষিকী প্যারেডে আরেকটি হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।
১৯৩৯ সালের ৫ অক্টোবর ওয়ারশতে হিটলারের গাড়িবহরের পথে ৫০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক রাখা হলেও অজ্ঞাত কারণে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি।

১৯৩৯ সালের ৮ নভেম্বর মিউনিখের একটি বিয়ার হলে একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস লাগানো হয়েছিল যেখানে হিটলার এনএসডিএপি প্রবীণদের সাথে তার বার্ষিক সভা করেছিলেন। বিস্ফোরণের ফলে ৮ জন মারা যায় এবং ৬৩ জন আহত হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে হিটলার ছিলেন না।
১৯৪২ সালের ১৫ মে পোল্যান্ডের একদল লোক হিটলার যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন সেখানে হামলা চালায়।

১৯৪৩ সালের ১৩ মার্চ, যখন হিটলার স্মোলেনস্ক পরিদর্শন করেছিলেন, তখন একটি কগন্যাক বাক্সে

একটি বোমা তার বিমানে উপহার হিসাবে রাখা হয়েছিল, তবে বোমাটি আবার বিস্ফোরিত হয়নি।

১৯৪৩ সালের ২১ শে মার্চ, যখন হিটলার বার্লিনে বন্দী সোভিয়েত সামরিক সরঞ্জামগুলির একটি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছিলেন, তখন কর্নেল রুডলফ ভন গার্সডর্ফ হিটলারের সাথে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল। যাইহোক, ফুহরার অকালে প্রদর্শনীটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং গার্সডর্ফের ডিটোনেটরটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য সবেমাত্র সময় ছিল।

১৯৪৪ সালের ১৪ জুলাই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হিটলারের শারীরিক ধ্বংসের লক্ষ্যে অপারেশন "ফক্সলি" চালাতে চেয়েছিল। পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়নি এবং বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই, হিটলারকে হত্যা করতে এবং মিত্র বাহিনীর সাথে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়, এতে ৪ জন নিহত হয়, কিন্তু হিটলার বেঁচে যান। তা সত্ত্বেও, ঘটনাটি তার স্বাস্থ্যের গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল: তার ডান হাতটি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল, তার মাথার

পিছনের চুল পুড়ে গিয়েছিল এবং তার ডান কানের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

অ্যাডলফ হিটলার এর সম্পর্কিত কিছু ভাবনা

অ্যাডলফ হিটলার ছিল একজন নাজি নেতা, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির শাসক ছিলেন। তার নেতৃত্বে জার্মানি ইউরোপে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে। হিটলার অপরাধমূলক নীতি অনুসরণ করে, যেমন ইহুদি নিধন, যা ইতিহাসে হোলোকাস্ট নামে পরিচিত। তার দেশপ্রেম ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদে বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে। হিটলারের শাসনকাল কেবল একটি দেশ নয়, বরং পুরো মানবজাতির জন্য এক কালো অধ্যায়। তার কর্মকাণ্ডের ফলে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু, নির্যাতন ও পঙ্গুত্ব ঘটে। তাকে নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, তার শাসনের পরিণতি পৃথিবীকে আরও সতর্ক হতে শিখিয়েছে।

অনেক জীবনীকারের মতে, হিটলার ১৯৩১ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিরামিষাশী ছিলেন। ধূমপানের প্রতিও তার নেতিবাচক মনোভাব ছিল, যে কারণে এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছিল নাৎসি জার্মানিতে।

তিনি বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। হিটলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফন হ্যাসেল বাখের মতে, তিনি প্রতিদিন অন্তত একটি বই পড়তেন।
১৯৩৬ সালে হিটলারের চ্যান্সেলরকালে জার্মানি চতুর্থ শীতকালীন অলিম্পিক গেমস এবং একাদশ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের আয়োজন করে। হিটলারই বিশ্বের প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি দুইবার অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন করেন।
হিটলারের জীবদ্দশায় তোলা শেষ ছবিটি ১৯৪৫ সালের ২০ এপ্রিল তার জন্মদিনের কিছু আগে তোলা হয়েছিল।

হিটলারের চিত্র অনেক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটিতে হিটলারের ব্যক্তিটি প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় আসে:

"হিটলার: দ্য লাস্ট টেন ডেজ", "দ্য বাঙ্কার", "হিটলার: দ্য রাইজ অফ দ্য ডেভিল", "মাই স্ট্রাগল" এবং অন্যান্য।

“তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা, একজন যোদ্ধা যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য লড়াই করেছিলেন, সার্বজনীন ন্যায়বিচারের প্রচারক ছিলেন। হিটলার একজন মহান সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু তার ঐতিহাসিক ভাগ্য এমন ছিল যে তিনি অভূতপূর্ব নৃশংসতার সময়ে বাস করেছিলেন, যা তাকে নামিয়ে এনেছিল, "নরওয়েজিয়ান লেখক, নোবেল বিজয়ী নট হামসুন বলেছেন।

ফুয়েরারের মৃত্যু

অ্যাডলফ হিটলার, চ্যান্সেলর এবং অত্যাচারী নাৎসি জার্মানি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল বার্লিনের ফুয়েরারবাঙ্কারে মাথা থেকে স্রাবের মাধ্যমে গুরুতর আত্মধ্বংস স্পষ্টতই জার্মানি হেরে যাবে বার্লিনের সংঘর্ষ, যা ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়। ইভা ব্রাউন, তার একদিনের উল্লেখযোগ্য অন্য, একইভাবে সায়ানাইড বিষক্রিয়া দ্বারা এটি শেষ করে। হিটলারের পূর্ববর্তী রচিত এবং মৌখিক নির্দেশনা অনুসারে, সেই মধ্যাহ্নে তাদের অবশিষ্ট অংশগুলি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে এবং ডাগআউটের সঙ্কট প্রস্থানের মাধ্যমে রাইখ চ্যান্সেলারি বাগানে সহায়তা করা হয়েছিল, যেখানে তারা পেট্রোলিয়ামে ভিজে পুড়ে গিয়েছিল। পরের দিন, ১ মে জার্মান রেডিওতে হিটলারের মৃত্যু সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি ঘোষণা করা হয়েছিল।

অ্যাডলফ হিটলারের মৃত্যু নিয়ে অসংখ্য জল্পনা-কল্পনা ছিল।

মিত্রশক্তি এবং ইউএসএসআর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এবং প্রাসঙ্গিক পরিষেবাগুলির জিজ্ঞাসাবাদের সাক্ষ্য অনুসারে, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল বার্লিনে সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে হিটলার তার স্ত্রী ইভা ব্রাউনের সাথে আত্মহত্যা করেছিলেন। সোভিয়েত ইতিহাস রচনায় মনে করা হয়, হিটলার বিষ প্রয়োগ করে আত্মহত্যা করেছিলেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। এমন একটি সংস্করণও রয়েছে যে হিটলার বিষের অ্যাম্পুল কামড়েছিলেন এবং একই সাথে পিস্তল দিয়ে নিজেকে গুলি করেছিলেন। হিটলারের পরিচারকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ৩০ এপ্রিল মধ্যাহ্নভোজের পর হিটলার তার প্রিয়জনদের বিদায় জানান এবং তাদের সঙ্গে করমর্দন করে স্ত্রী ইভা ব্রাউনকে নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্টে যান, সেখান থেকে তিনি গুলির শব্দ শোনা যায়।

হিটলারের ভৃত্য হেইঞ্জ লিঞ্জ ফুয়েরারের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে, ফুয়েরারের অ্যাডজুট্যান্ট অটো গানশে, গোয়েবলস, বোরম্যান এবং আচম্যানকে নিয়ে। তারা হিটলারের মরদেহ সোফায় শুয়ে থাকা একটি সামরিক কম্বলে মুড়ে রাইখ চ্যান্সেলর পার্কে নিয়ে যায়। লাশগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৯৪৫ সালের ৫ মে ঘটনাক্রমে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। মেডিক্যাল কর্নেল এফ আই শকারাভস্কি দেহাবশেষের গবেষণায় বিশেষজ্ঞদের কমিশনের প্রধান। হিটলারের দন্ত চিকিৎসক কেট হিউসারম্যানের সহায়তায় দেহাবশেষগুলো হিটলারের বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি নিশ্চিত হন যে দেহটির কৃত্রিম অঙ্গগুলি হিটলারের অনুরূপ। তবে সোভিয়েত শিবির থেকে ফিরে আসার পর তিনি তার নির্দেশ ত্যাগ করেন।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তদন্ত বিভাগ হিটলার ও ইভা ব্রাউনের মৃতদেহ এনকেভিডির একটি ঘাঁটিতে সমাহিত করে। আন্দ্রোপভের পরামর্শে যখন এই ঘাঁটির অঞ্চলটি জিডিআরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তখন দেহাবশেষগুলি খনন করা হয়েছিল, পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং ছাই এলবে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র কৃত্রিম অঙ্গ এবং হিটলারের মাথার খুলির গুলিবিদ্ধ অংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা রাশিয়ান আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়েছে যেখানে হিটলার রক্তের চিহ্ন নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এফএসবি আর্কাইভের প্রধান তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কৃত্রিম অঙ্গটির সত্যতা বেশ কয়েকজন

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেছেন। তবে হিটলারের জীবনীকার ওয়ার্নার মাজার অস্বীকার করেছেন যে মাথার খুলির অংশটি আসলে হিটলারের ছিল।

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে, কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছিলেন যে মাথার খুলির ডিএনএ বিশ্লেষণ ৪০ বছরের কম বয়সী একজন মহিলার ছিল। এফএসবি প্রতিনিধিরা এই বিবৃতি অস্বীকার করেছেন।

এবং অবশেষে, অ্যাডলফ হিটলারের মৃত্যু সম্পর্কে অসংখ্য জল্পনা-কল্পনা, অনুমান যে তিনি মারা যাননি এবং চতুর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন, তার অবসান ঘটে। ১৯৪৫ সালে বার্লিনে সায়ানাইড বিষক্রিয়া ও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান হিটলার। মস্কোয় রাখা স্বৈরশাসকের দাঁতের একটি টুকরোর ওপর ভিত্তি করে এ তথ্য জানিয়েছেন ফরাসি গবেষকরা।
"এই দাঁতগুলো হিটলারের, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের গবেষণা প্রমাণ করে যে হিটলার ১৯৪৫ সালে মারা গিয়েছিলেন, "অধ্যাপক ফিলিপ চার্লি বলেছেন। আমরা হিটলারকে নিয়ে সব ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারি। তিনি সাবমেরিনে করে আর্জেন্টিনায় পালিয়ে যাননি, অ্যান্টার্কটিকার কোনো গোপন ঘাঁটিতে বা চাঁদের অন্ধকারে লুকিয়ে

থাকেননি। ইউরোপিয়ান জার্নাল অব ইন্টারনাল মেডিসিনে গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। হিটলারের খারাপ দাঁত এবং তার অনেক দাঁত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে একটি সাদা স্তর (পাথর) ছিল এবং মাংসের কোনও অবশিষ্টাংশ ছিল না। এটি অবশ্যই সত্য, যেহেতু স্বৈরশাসক একজন নিরামিষভোজী ছিলেন।

হিটলারের খারাপ দাঁত এবং তার অনেক দাঁত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে একটি সাদা স্তর (পাথর) ছিল এবং মাংসের কোনও অবশিষ্টাংশ ছিল না। এটি অবশ্যই সত্য, যেহেতু স্বৈরশাসক একজন নিরামিষভোজী ছিলেন।

২০১৭ সালের মার্চ ও জুলাই মাসে রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস এবং স্টেট আর্কাইভস বিজ্ঞানীদের হিটলারের হাড়গোড় নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেয়। ফরাসিরা ফুয়েরারের মাথার খুলি অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। মাথার খুলির বাম পাশে একটি গুলির ছিদ্র পাওয়া গেছে। সাধারণভাবে, গবেষণাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত ধারণাকে নিশ্চিত করেছে যে হিটলার ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল বার্লিনে তার স্ত্রী ইভা ব্রাউনের সাথে তার বাঙ্কারে মারা যান। যাইহোক, বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত যে ফুয়েরার ঠিক কী থেকে মারা গিয়েছিলেন: একটি বুলেট বা সায়ানাইড সহ একটি অ্যাম্পুল? এটা একটা বা অন্যটা হতে পারে। উপরন্তু, হিটলারের মাথার খুলির মুখে বারুদের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যার অর্থ বন্দুকটি মুখের দিকে নয়, ঘাড়ে বা কপালে লক্ষ্য

করা হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে, দাঁতের নীলচে স্তর সায়ানাইড এবং দাঁতের ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নির্দেশ করতে পার